‘সামাজিক ব্যবসা’ তত্ত্ব ও গ্রামীণ-ডানোন কারবার

কল্লোল মোস্তফা

ড. মুহাম্মদ ইউনূস দাবি করেন, পুরনো আর যে কোনো আদর্শ বা ধারণার তুলনায় দুনিয়া পাল্টানোর সম্ভাবনা সামাজিক ব্যবসারই বেশি, কারণ ‘সামাজিক ব্যবসা’ ধারণাটি অসম্ভব শক্তিশালী, আবার একই সাথে ভীষণ নমনীয়। সামাজিক ব্যবসা পুঁজিবাদের সাথে খুব চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যায় এবং বাজার ব্যবস্থায় কোটি কোটি নতুন ক্রেতা বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি করে। ‘সামাজিক ব্যবসা’ নামের এই মেকানিজমের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে পুনরুজ্জীবিত করে পুঁজিবাদেরই সৃষ্ট ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের যে দাবি মুহাম্মদ ইউনূস করছেন, এই লেখায় তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যদি কখনও চারপাশের দুনিয়াটাকে খারাপ লাগতে শুরু করে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-রোগ-অশিক্ষা ও বেকারত্ব সমস্যা অসংখ্য মানুষকে জর্জরিত করে রেখেছে বলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকাটা কষ্টের মনে হয়, যদি মানুষকে এইসব সংকট থেকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, তাহলে কী করা উচিত? দুনিয়াটাকে এই দারিদ্র্য-রোগ-শোক-বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে তরুণদের সামাজিক ব্যবসা করার আহ্বান জানিয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস (ইউনূস, ২০১০: ২৭)। তিনি মনে করেন, পুরনো আর যে কোনো আদর্শ বা ধারণার তুলনায় দুনিয়া পাল্টানোর সম্ভাবনা সামাজিক ব্যবসারই বেশি, কারণ ‘সামাজিক ব্যবসা’ ধারণাটি অসম্ভব শক্তিশালী, আবার একই সাথে ভীষণ নমনীয়। সামাজিক ব্যবসা পুঁজিবাদের সাথে খুব চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যায় এবং বাজার ব্যবস্থায় কোটি কোটি নতুন ক্রেতা বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি করে। বিদ্যমান ব্যবসার কাঠামোকে হুমকিগ্রস্ত করার বদলে সামাজিক ব্যবসা উল্টো একে পুনরুজ্জীবিত করার একটি উপায় (ইউনূস, ২০১০: ২৯)।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে এই সকল সংকট সমাধানের কথা বললেও তিনি স্বীকার করেন, এই সংকটগুলো পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে এই সকল সংকট সমাধানের কথা বললেও তিনি স্বীকার করেন, এই সংকটগুলো পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। তিনি লিখেছেন, পুঁজিবাদ স্রেফ মুনাফা তৈরিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এই সমস্যাগুলো তৈরি করেছে এবং তাত্ত্বিকভাবে এই সকল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এ কারণে ইউরোপের বহু দেশ রাষ্ট্রকে যথেষ্ট সক্ষম করেছে, যেন রাষ্ট্র দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বহন করে। তিনি মনে করেন, প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা এইসব সমস্যার সমাধান যে হওয়া সম্ভব নয়, এটা বুঝতে পারার মতো যথেষ্ট স্মার্ট এই ইউরোপীয়রা, তাই তারা রাষ্ট্রের মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করেছে। একই সাথে তিনি মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্রের পক্ষে ইউরোপের মতো জনকল্যাণ রাষ্ট্র হওয়ার মতো যথেষ্ট ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা ও বস্তুগত সম্পদ নেই, যে কারণে এই সকল দেশের জন্য চাই এক নতুন ধরনের মেকানিজম। সামাজিক ব্যবসা হলো এরকম একটি মেকানিজম (ইউনূস, ২০১০: ১৭)। ‘সামাজিক ব্যবসা’ নামের এই মেকানিজমের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে পুনরুজ্জীবিত করে পুঁজিবাদেরই সৃষ্ট ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের যে দাবি ড. মুহাম্মদ ইউনূস করছেন, এ লেখায় তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হবে।

সামাজিক ব্যবসার ইতিকথা

ড. ইউনূস ব্যবহৃত ‘সামাজিক ব্যবসা’ কথাটি তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও এর পেছনে যে ধারণাটি কাজ করে অর্থাৎ বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন না করে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার ও পরিবর্তনের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণের ধারণাটি কিন্তু নতুন নয়। সমবায় বা ‘কো-অপারেটিভ’, ‘সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ’, ‘সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ’ ইত্যাদি হরেক রকম সামাজিক উদ্দ্যেশ্যমূলক ব্যবসায়িক উদ্যোগ অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। মুহাম্মদ ইউনূসের আগে ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়টুকুতে ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক ও লেবার পার্টির সদস্য রাজনীতিবিদ মাইকেল ইয়ং একই ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর স্থাপিত ‘ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি স্টাডিজ’ এখন ব্রিটেনে ‘ইয়ং ফাউন্ডেশন’ নামে কাজ করছে (আজমেরি, ২০১২: ১৪৫)।

কিংবা তারও আগে মানবতাবাদী ও ইউটোপীয় বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী ও সমবায় আন্দোলনের জনক রবার্ট ওয়েনের কথা বলা যেতে পারে, যিনি ১৮১০ সালে স্কটল্যান্ডের নিউ লানার্কে তাঁর শিক্ষক জেরেমি বেনথামের সাথে মিলিতভাবে স্থাপিত টেক্সটাইল কারখানাটিকে শ্রমিক কল্যাণমূলক করে তোলার চেষ্টা করেন– শ্রমিকের শ্রমঘণ্টা তুলনামূলকভাবে কম, কারখানার খরচে শিশুদের জন্য স্কুল, শ্রমিকদের জন্য আবাসন ইত্যাদি মহৎ প্রচেষ্টার সুনাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে; এর সুবাদে নিউ লানার্ক বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও রাজন্যবর্গের (যে তালিকায় রাশিয়ার ভবিষ্যৎ জার নিকোলাসের নামও অন্তর্ভুক্ত) তীর্থস্থানে পরিণত হয়। তবে একপর্যায়ে তাঁর এই উদ্যোগ ভেস্তে যায় এবং ১৮২৮ সালের দিকে তিনি সেই মিলের ম্যানেজমেন্ট থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর তিনি চিন্তা করেছেন ৫০০ থেকে ৩০০০ মানুষের সমন্বয়ে ছোট ছোট কমিনিউটি গঠনের কথা, যারা তাদের শ্রমের ফসল সবাই মিলিতভাবে ভাগ করে নেবে। কিন্তু গোটা রাষ্ট্র একভাবে চলবে আর তার মাঝে একটা ছোট সমাজ অন্যভাবে চলবে– এমনটি বেশিদিন চলতে পারে না; ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যে স্থাপিত তাঁর প্রথম প্রজেক্ট ‘নিউ হারমোনি সোসাইটি’ ভেঙে পড়ে দুই বছর যাওয়ার আগেই (হ্যারিসন, ২০০৯)।

অবশ্য আজকের যুগে ড. ইউনূসের মতো সামাজিক ব্যবসায়ীরা যে রবার্ট ওয়েনের মতো মানবতাবাদী বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীর জায়গা থেকে নয়, বরং সরাসরি পুঁজিবাদের সংস্কারক হিসেবে নতুন নতুন ব্যবসা বিকাশের অবস্থান থেকেই ‘সামাজিক ব্যবসা’র কথা বলছেন, সেটা মুহাম্মদ ইউনূস বেশ খোলাখুলিই স্বীকার করেন।

ড. ইউনূসের সামাজিক ব্যবসা

সামাজিক ব্যবসাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে মুহাম্মদ ইউনূস (ইউনূস সেন্টার, ২০০৭) বলেছেন:

'সামাজিক ব্যবসা একটি উদ্দেশ্যচালিত ব্যবসা। বিনিয়োগকারী ক্রমান্বয়ে তাঁর বিনিয়োগকৃত অর্থ তুলে নিতে পারবেন কিন্তু তার বাইরের কোনো অর্থ ডিভিডেন্ড হিসেবে নিতে পারবেন না। এই বিনিয়োগের উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবেই কোম্পানির কার্যক্রমের মাধ্যমে কেবল এক বা একাধিক সামাজিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করা, বিনিয়োগকারীর কোনো ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকলে চলবে না। কোম্পানিকে অবশ্যই তার খরচ তুলে নিতে হবে এবং মুনাফা করতে হবে, সেই সাথে সামাজিক উদ্দেশ্যগুলোও পূর্ণ করতে হবে; যেমন– গরিবের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, অর্থঋণ সেবাদান, অপুষ্ট শিশুদের পুষ্টির জোগান, নিরাপদ পানি সরবরাহ, নবায়নযোগ্য শক্তির সূচনা ঘটানো ইত্যাদি কাজ করতে হবে ব্যবসায়িক উপায়ে।'

মুহাম্মদ ইউনূস (২০১০: ৩) সামাজিক ব্যবসার ৭টি নীতিমালা ঘোষণা করেছেন, এগুলো হলো:

১) ব্যবসার উদ্দেশ্য হবে দারিদ্র্য দূরীকরণ কিংবা এক বা একাধিক সামাজিক সমস্যা দূর করা, যেগুলো জনগণ এবং সমাজকে হুমকির মুখে ফেলে দেয় (যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, পরিবেশ ইত্যাদি)। এর উদ্দেশ্য কখনোই মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয়।

২) এ ব্যবসা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে।

৩) বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ফিরে পেলেও এর বাইরে কোনো ডিভিডেন্ড পাবেন না।

৪) বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত দিয়ে দেওয়ার পর লাভের টাকার পুরোটাই কোম্পানির বিকাশ ও উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হবে।

৫) এ ব্যবসা পরিবেশ সচেতন হবে।

৬) শ্রমিকদের ভালো কাজের পরিবেশ ও মার্কেট ওয়েজ বা বাজারে প্রচলিত মজুরি প্রদান করা হবে।

৭) এ ব্যবসা আনন্দের সাথে করতে হবে।

এখন, এই যে সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগকারী মুনাফা তুলে নিতে পারবেন না, সেটা কোম্পানিতেই থেকে যাবে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি পুঁজিমালিক কেন এ ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে আসবেন– এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। ড. ইউনূস (২০০৭: ১৮) এর উত্তরে বলেছেন:

'পুঁজিবাদ একটি অর্ধবিকশিত কাঠামো। মানুষ সম্পর্কে পুঁজিবাদের ধারণা সংকীর্ণ, পুঁজিবাদ মনে করে মানুষ স্রেফ একমাত্রিক একটা সত্তা, যার সমস্ত ভাবনা কেবল মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দিকে'।

তিনি (২০০৭:২১) আরো বলেছেন–

'পুঁজিবাদের কাঠামোকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য আমাদের আরেক ধরনের ব্যবসা চালু করতে হবে, যা মানুষের বহুমাত্রিকতাকে স্বীকৃতি দেবে। আমাদের প্রচলিত ব্যবসাগুলোকে যদি মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ব্যবসা বলি, তাহলে নতুন ধরনের ব্যবসাটিকে বলতে পারি সামাজিক ব্যবসা। উদ্যোক্তারা সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে নয়, সুনির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্য পূরণের জন্য সামাজিক ব্যবসা স্থাপন করবেন।'

ড. ইউনূসের (২০১০: ১-২) মতে, এই সামাজিক ব্যবসা দুই ধরনের হতে পারে:

টাইপ ১: না-ক্ষতি, না-ডিভিডেন্ড ভিত্তিতে এ ধরনের ব্যবসা কেবল সামাজিক উদ্দেশ্য মাথায় রেখে কাজ করবে। মালিকানা বিনিয়োগকারীর হাতে থাকবে কিন্তু তিনি এখান থেকে কোনো মুনাফা ডিভিডেন্ড আকারে তুলে নিতে পারবেন না, সমস্ত মুনাফা ব্যবসার বিকাশের কাজে পুনর্বিনিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের ব্যবসার উদাহরণ হলো গ্রামীণ-ডানোন বা গ্রামীণ-ভিয়োলিয়ার ব্যবসা।

টাইপ ২: এ ধরনের ব্যবসার মালিকানা থাকবে দরিদ্রের হাতে, যারা প্রত্যক্ষ ডিভিডেন্ড থেকে কিংবা পরোক্ষ সুবিধা নিয়ে উপকৃত হতে পারবে। এ ধরনের ব্যবসার উদাহরণ হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের কথা বলা যায় ।

সামাজিক ব্যবসার দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রপঞ্চ

আমাদের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রচলিত ব্যবসার সাথে সামাজিক ব্যবসার পার্থক্য হলো, সামাজিক ব্যবসাও প্রচলিত ব্যবসার মতো মুনাফা করার কাজটি করবে কিন্তু এটি তার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না। কারণ এ ব্যবসার উদ্যোক্তার ডিভিডেন্ড আকারে মুনাফা তুলে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কাজেই মুনাফা সর্বোচ্চকরণের কোনো বাড়তি চাপ কোম্পানির ওপর থাকবে না। এখন কোনো কোম্পানির মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ব্যাপারটি কি মালিকপক্ষের চাওয়া বা না-চাওয়ার ওপর নির্ভর করে, নাকি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে টিকে থাকতে গেলে কোম্পানিকে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা করতেই হয়– এ বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। একই সাথে যাচাই করা প্রয়োজন মুনাফা কামানো ও দারিদ্র্য দূরীকরণের সম্ভাব্যতাটিও।

কোনো কোম্পানির মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ব্যাপারটি কি মালিকপক্ষের চাওয়া বা না-চাওয়ার ওপর নির্ভর করে, নাকি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে টিকে থাকতে গেলে কোম্পানিকে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা করতেই হয়–এ বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

দারিদ্র্যের কারণ যে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকের শ্রমের ফসল শ্রমিককে না দিয়ে তার বেশির ভাগ মুনাফা হিসেবে মালিকশ্রেণির আত্মসাৎ, সে কথা ড. ইউনূসের অজানা নয়। তিনি (২০০৭: ১১৪) লিখেছেন:

'আপনি যদি দরিদ্রদের সাথে যথেষ্ট সময় পার করেন, আপনি বুঝতে পারবেন তাদের দারিদ্র্যের কারণ হলো তাদের শ্রমের আসল মূল্য তারা পায় না। আর এর কারণও তো পরিষ্কার। পুঁজির ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পুঁজির মালিকানা যাদের হাতে, গরিবরা কাজ করে তাদের সুবিধার জন্য।'

শ্রমিক যা পায় না তা-ই মালিকের মুনাফা; মালিকের মুনাফার এটাই একমাত্র উৎস। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুটিকয়েক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বেশির ভাগ সম্পদের মালিক। কলকারখানা কিংবা কৃষিজমিতে কাজ করে যে শ্রমিক বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে কিংবা ফসল ফলায়, মজুরির বিনিময়ে তার প্রায় পুরোটাই সেই মালিকগোষ্ঠী আত্মসাৎ করে। আত্মসাৎ, কেননা কোনো কাঁচামালকে পণ্যে রূপান্তর করতে বাকি সব কিছু থাকলেও শ্রম না দিলে সেটা থেকে কোনো নতুন মূল্য তৈরি হবে না, ফলে সেটা বাজারে লাভে বিক্রি করা যাবে না। কাজেই বিক্রয়মূল্য থেকে কাঁচামাল ও অন্যান্য খরচ বাদ দিলে যে মূল্যটুকু থাকে তার পুরোটার মালিকানাই হওয়া উচিত শ্রমিকের। কিন্তু পুঁজি মালিক তার সামান্য একটা অংশ মজুরি হিসেবে শ্রমিককে দিয়ে বাকিটা মুনাফা

হিসেবে আত্মসাৎ করে। যেহেতু শ্রমিককে যত কম মজুরি দেওয়া যাবে মালিকের তত লাভ হবে, সেহেতু মালিকশ্রেণি সব সময়ই শ্রমিকের মজুরি সর্বনিম্ন রাখার চেষ্টা করতে থাকে।

এখন মালিক এই মজুরি কত কম দিতে পারে? মালিক মজুরি কমাতে কমাতে কখনই সাবসিস্টেন্স লেভেল বা একেবারে ন্যূনতম খেয়ে-পরে টিকে থাকার জন্য শ্রমিকের যত টাকা প্রয়োজন হয় তার চেয়ে বেশি কমাতে পারে না, কারণ তাহলে তার মুনাফা তৈরির মেকানিজম বিঘ্নিত হবে। শ্রমের বাজারমূল্য বা মজুরি এভাবেই নির্ধারিত হয়। কিন্তু উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা যদি শ্রমিকের হাতে থাকত তাহলে কিন্তু তার শ্রম থেকে যে নতুন মূল্য তৈরি হয় সেটা কেউ আত্মসাৎ করতে পারত না। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে তা হবার নয়। এই যে শ্রমিকের শ্রমের ফসল থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করা– এটাই হলো শোষণ বা এক্সপ্লয়টেশন আর সমাজের বেশির ভাগ মানুষ এই শোষণের শিকার বলেই তারা সাবসিস্টেন্স লেভেলের কাছাকাছি বসবাস করা দরিদ্র মানুষ। কাজেই দারিদ্র্যের মূল কারণ হলো এই শোষণ বা এক্সপ্লয়টেশন এবং এটি যত দিন জারি থাকবে অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমের একটা অংশ মালিকরা আত্মসাৎ করতে থাকবে, তত দিনই দারিদ্র্য থাকবে।

তাহলে মুহাম্মদ ইউনূস দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে শোষণ ও মুনাফার এই ভূমিকার কথা জেনেও কিভাবে বলছেন যে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মুনাফা শোষণ একই সাথে চালাবেন? মুনাফা যদি হয়, তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণ কিভাবে হবে? ব্যক্তি ডিভিডেন্ড নেবে না ভালো কথা, কিন্তু কোম্পানি তো মুনাফা করবে, সেই মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ হবে, আবারও মুনাফা হবে– ব্যক্তি মুনাফা নিলেও এই কাজই হতো। তাহলে তো শ্রমিক তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্যটুকু থেকে আগের মতোই বঞ্চিত হচ্ছে! শোষিত শ্রমিকের কাছে শোষণ কোনো ব্যক্তি করছে, নাকি কোনো কোম্পানি করছে তার কোনো ভেদ-বিভেদ আছে কি? ব্যক্তি তার শ্রমের ফসলে ভাগ বসালে শ্রমিক তার শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে আর ব্যক্তি শোষণ না করে যদি কোম্পানি (বা কোনো রোবট বা কোনো ভিনগ্রহবাসী যে-ই হোক না কেন) সেই কাজটিই করে তাহলে কি শ্রমিক আহ্লাদে আটখানা হবে! হতো যদি তার শ্রমের ফসল তার কাছেই ফিরে আসত– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদিসহ তার যাবতীয় প্রয়োজন যদি কোম্পানি তার মুনাফার টাকায় মেটাত। কিন্তু হায়! কোম্পানি তো সেসব নিয়েও (নিয়েই) ব্যবসা করবে (এবং করছেও, পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য), কারণ মুহাম্মদ ইউনূসের ঘোষণাই হলো ঐসব সামাজিক উদ্দেশ্যও পূর্ণ করতে হবে ব্যবসায়িক উপায়ে!

অনেকে বলতে পারেন– কেন, সামাজিক ব্যবসার টাইপ ২ তো ঠিক এ ধরনেরই একটা কথা বলা আছে বলে মনে হলো যে মালিক হবে দরিদ্ররা এবং তারা সরাসরি ডিভিডেন্ড আকারে মুনাফার ভাগও পাবে। নিঃসন্দেহে বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যদি শ্রমিকরা নিজেরাই নিজেদের কারখানার মালিক হয়, যদি স্রেফ কাগজে-কলমে নয়, উৎপাদন ও বিপণনের পুরো নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকে, যদি নিজেদের সৃষ্ট মুনাফা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে, তাহলে নির্দিষ্ট একটা মাত্রা পর্যন্ত তা প্রচলিত কারখানা/ব্যবসার তুলনায় শ্রমিকদের জন্য কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, স্পেন, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ভেনিজুয়েলা, ভারতসহ সারা দুনিয়ায় অসংখ্য ওয়ার্কার্স কো-অপারেটিভ স্থাপিত হয়েছে এবং এগুলো নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। দুনিয়ার বৃহত্তম শ্রমিক সমবায় মন্ড্রাগন হলো স্পেনের সপ্তম বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যেখানে ৮০ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করে (গাসপার, ২০১৪)।

এ ধরনের শ্রমিক সমবায়গুলোর সীমাবদ্ধতা হলো, পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতার মধ্যেই ওগুলোকে চলতে হয়, প্রতিযোগিতামূলকভাবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়, বাজারে টিকে থাকার জন্য উৎপাদন খরচ ও শ্রমিকের মজুরি কম রাখতে হয়, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ দিতে হয়– এমনকি ছাঁটাইও করতে হয়। তাছাড়া শুধু উৎপাদনের উপকরণের (মিনস অব প্রোডাকশন) মালিকানা শ্রমিকদের হাতে থাকাই যথেষ্ট নয়, উৎপাদনের ধরন (মোড অব প্রডাকশন)– অর্থায়ন, কারিগরি জ্ঞান, কাঁচামালের উৎস, বাজার ইত্যাদি সব কিছু একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় ছোট ছোট শ্রমিক সমবায়ের পক্ষে শ্রমিকদের জন্য প্রচলিত কোম্পানির তুলনায় একেবারে ভিন্ন কিছু করা আসলেই কঠিন। কিন্তু টাইপ ২ সামাজিক ব্যবসা বলতে মুহাম্মদ ইউনূস এ রকম কোনো 'শ্রমিক সমবায়' বা ওয়ার্কার্স কো-অপারেটিভের কথাও বলছেন না, তিনি 'দরিদ্র মালিকানা'র কথা বলছেন, যেখানে আসলে নিয়ন্ত্রণ থাকে 'বড়লোকের'।

বাস্তবে ইউনূস সাহেব যতগুলো সামাজিক ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছেন তার একটিও দরিদ্র মালিকানার ধারেকাছে নেই, উল্টো তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ গ্রুপ কখনও মালিকানার অংশীদারিত্বে মেতেছে ফরাসি বহুজাতিকের সাথে, কখনও নরওয়ে বা জার্মান বহুজাতিকের সাথে

বাস্তবে ইউনূস সাহেব যতগুলো সামাজিক ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছেন তার একটিও দরিদ্র মালিকানার ধারেকাছে নেই, উল্টো তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ গ্রুপ কখনও মালিকানার অংশীদারিত্বে মেতেছে ফরাসি বহুজাতিকের সাথে, কখনও নরওয়ে বা জার্মান বহুজাতিকের সাথে; যদিও তিনি দাবি করেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকৃত মালিক নাকি তার ঋণগ্রহীতারাই। এটা অনেক পুরনো একটা কৌশল। কাগজে-কলমে এসব লেখা থাকলেও বাস্তবে এর পুঁজি ও মুনাফার সমস্ত নিয়ন্ত্রণই থাকে বোর্ড অব ডিরেক্টরসের কাছে। সরাসরি মুনাফা না নিলেও পরিচালকের বেতন-বোনাস হিসেবে বিনিয়োগকারী কর্তৃক বিপুল অর্থ নেওয়ার সুযোগও এসব কোম্পানিতে থাকে। যা হোক, বাস্তবে কখনও যদি সত্যি সত্যি তিনি এমন একটি কোম্পানি খুলে ফেলেন, যার মালিক– এমনকি তার বোর্ড অব ডিরেক্টরস পর্যন্ত দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ– এমনকি সেক্ষেত্রেও এর মাধ্যমে শোষণ বৈষম্য দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। কারণ গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার সমস্ত উৎপাদন ও মালিকানা সম্পর্কের পরিবর্তন না ঘটিয়ে স্রেফ একটি-দুটি কোম্পানির মালিকানা কিছু দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দিলে হয়তো নতুন কিছু ক্ষুদ্র পুঁজিপতি সৃষ্টিই করা যাবে, যারা আবার সেই কোম্পানির মুনাফা ও পুঁজির বিকাশের জন্য সমাজের অন্যদের শোষণ করে নতুন সর্বহারা শ্রমজীবীর সৃষ্টি করবে এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্যকে জারি রাখবে!

মুনাফা সর্বোচ্চ করা-না করা প্রসঙ্গে

সামাজিক ব্যবসা যেহেতু মুনাফা করেই টিকে থাকবে, কাজেই এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়– এ কথাটি মেনে নিয়েও অনেকে তর্ক তুলতে পারেন, সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্য দূর করা না গেলেও সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে এর প্রকোপ তো কিছুটা কমানো সম্ভব হতে পারে। তাঁরা বলতে পারেন, সামাজিক ব্যবসা তো মুনাফা সর্বোচ্চকরণের বিরুদ্ধে। সামাজিক ব্যবসায় মুনাফা তুলনামূলক কম হলে শোষণ কম

হবে, ফলে দারিদ্র্যের মাত্রাও কমবে। আর মুনাফা সর্বোচ্চকরণের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সামাজিক ব্যবসার নিজস্ব একটা মেকানিজমও আছে: সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগকারী ব্যক্তি মুনাফা তুলে নিতে পারবে না, ফলে কোম্পানিকে সে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের জন্য চাপও প্রয়োগ করবে না। এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন তোলা অত্যন্ত জরুরি– মুনাফা সর্বোচ্চ করা-না করার ব্যাপারটি কি ব্যক্তির চারিত্র্যের ওপর নির্ভর করে? অর্থাৎ মালিক ভালো হলে মুনাফা কম করবে আর খারাপ হলে মুনাফা বেশি করবে কিংবা বিষয়টি কি এ রকম যে কোম্পানি মুনাফা সর্বোচ্চ করতে চায় স্রেফ মুনাফালোভী মালিকের চাপের কারণে, নাকি বিষয়টি কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ব্যাপার নয়, কোম্পানিকে বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে টিকে থাকতে গেলে এবং বিকাশ লাভ করতে গেলে তাকে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা করতেই হবে?

বিষয়টি বোঝার জন্য প্রথমে দেখা দরকার মালিকশ্রেণি কোন কোন খাতে মুনাফাটুকু ব্যয় করে। ব্যয় অনুসারে মুনাফাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে– এক ভাগ যায় মালিকের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের কাজে আর আরেক ভাগ যায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, বাড়তি কাঁচামাল কিংবা বাড়তি শ্রমিক নিয়োগের কাজে (এটাই বৃহত্তর অংশ)। মুনাফার এই দ্বিতীয় ব্যবহারটুকু খুব গুরুত্বপূর্ণ। মালিক যদি মুনাফা কম করে তাহলে হয় তাকে ব্যক্তিগত ভোগবিলাস কমিয়ে ফেলতে হবে (যা সে একান্ত বাধ্য না হলে করতে চাইবে না) অথবা নতুন নতুন বিনিয়োগ বা বিনিয়োগের সম্প্রসারণের কাজে অর্থ ব্যয় কমিয়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয় কাজটি হবে তার জন্য আত্মঘাতী, কেননা সেক্ষেত্রে বাজারের প্রতিযোগিতায় সে সহজেই তার সেই প্রতিযোগীর কাছে হেরে যাবে, যে ক্রমাগত মুনাফার একটা বর্ধিত অংশ খরচ করে ক্রয় করা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে এবং পণ্য উৎপাদনের সময় কমিয়ে অর্থাৎ প্রডাক্টিভিটি বা উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তার চেয়ে সস্তায় তার চেয়ে ভালো মানের পণ্য বাজারে বিক্রি করতে পারবে।

সামাজিক ব্যবসার ৭ নীতিমালার ৬ নম্বর নীতিমালায় বলেই দিয়েছেন, শ্রমিকদের ভালো কাজের পরিবেশ প্রদান করা হলেও তাদের মজুরি হবে মার্কেট ওয়েজ বা বাজারে প্রচলিত মজুরি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোনো একজন মালিক ব্যক্তিগতভাবে চাইলেই (পুঁজিপতি হিসেবে এ রকমটা তার চাওয়ার কথাও না, আমাদের আলোচ্য মুহাম্মদ ইউনূস তা চাচ্ছেন না– এ বিষয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব) মুনাফা কম করে শ্রমিকের দারিদ্র্য দূর করে ফেলতে পারে না। কিন্তু যখন কোনো একটি সেক্টরের সার্বিকভাবে শ্রমিক আন্দোলনের কারণে কিংবা রাষ্ট্রের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দেওয়ার কারণে সকল মালিক বাধ্য হয় মজুরি বাড়াতে, তখন কিন্তু সে আর দশজন মালিকের মতোই বাধ্য হয় মুনাফার পরিমাণ কমাতে, কারণ সে তুলনামূলক কম মজুরি দিলে সহজেই শ্রমিক অসন্তোষ হবে কিংবা শ্রমিকরা তার কারখানায় থাকবে না। অবশ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজার্ভ আর্মি বড় থাকলে অর্থাৎ বেকার শ্রমিক বেশি থাকলে কিংবা রাষ্ট্রীয় নজরদারি অনুপস্থিত থাকলে বা শ্রমিকশ্রেণি অসংগঠিত থাকলে তখন সমাজের সার্বিক বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে মালিক ব্যক্তিটি মজুরি কমিয়ে একেবারে সাবসিস্টেন্স লেভেলের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা এবং তার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বেশি মুনাফা করার মাধ্যমে সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছার চেষ্টা করে– এ রকম একটা পরিস্থিতিতেই কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমিকদের সস্তা শ্রম শোষণ করছে দেশীয় ও বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণি।

ড. ইউনূস কি এর ব্যতিক্রম? তিনি মুনাফা সর্বোচ্চ না করার চেষ্টার কথা বলছেন ঠিকই কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি তো তিনি দেবেন বাজারের আর দশটি মুনাফা সর্বোচ্চকারী বা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোম্পানি যে হারে দেয় তার সমান হারেই; সামাজিক ব্যবসার ৭ নীতিমালার ৬ নম্বর নীতিমালায় বলেই দিয়েছেন, শ্রমিকদের ভালো কাজের পরিবেশ প্রদান করা হলেও তাদের মজুরি হবে মার্কেট ওয়েজ বা বাজারে প্রচলিত মজুরি। এ অর্থেও তাঁর সামাজিক ব্যবসা আর দশটা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোম্পানি থেকে আলাদা কিছু নয়।

সামাজিক ব্যবসার কেস স্টাডি: গ্রামীণ-ডানোন কারবার

মুহাম্মদ ইউনূসের 'সামাজিক ব্যবসা'র ধারণাটি সারা দুনিয়ার নজর কাড়ে ২০০৬ সালে, যখন বহুজাতিক ডানোন ও গ্রামীণ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে 'গ্রামীণ-ডানোন ফুডস লি:' নামের সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে। খুব সচেতনভাবে ডিজাইন করা ও বহুল প্রচারিত এই সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়:

- স্বল্প মূল্যে পুষ্টি সরবরাহ করে বাংলাদেশের সকল শিশুকে স্বাস্থ্যবান করে তোলা।
- স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে ব্যবসার বিভিন্ন পর্যায়ে (উৎপাদন, সরবরাহ, বিপণন ইত্যাদি) যুক্ত করে তাদের কর্মসংস্থান ও জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো (গ্রামীণ-ডানোন, ২০১০)।

স্বল্প মূল্যে পুষ্টি সরবরাহের জন্য বেছে নেওয়া হয় 'শক্তি দই'কে। দই উৎপাদনের জন্য গ্রামীণ ও ডানোনের ৫০-৫০ যৌথ উদ্যোগে বগুড়ার বেতগাড়ীতে একটি কারখানা স্থাপন করা হয়। গ্রামীণ-ডানোনের সিংহ মার্কা শক্তি দইয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়, এতে বাড়তি ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান মেশানো হয়, যা নাকি একটি শিশুর দৈনিক পুষ্টি চাহিদার ৩০% মেটাবে। মুহাম্মদ ইউনূসের সামাজিক ব্যবসা তত্ত্ব অনুসারে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি টেকসইভাবে টিকে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মুনাফা করবে এবং ডানোন বা গ্রামীণের বিনিয়োগকারীরা সেই মুনাফার কোনো ভাগ পাবে না। ফরচুন ম্যাগাজিন এই 'শক্তি দই' নিয়ে তাদের একটা ফিচার ছেপেছিল 'সেভিং দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ আ কাপ অব ইয়োগার্ট' বা 'দইয়ের কাপের মাধ্যমে দুনিয়া উদ্ধার' শিরোনামে (ফরচুন, ২০০৭)।

সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে আদৌ দারিদ্র্য দূর করা যায় কি না, এ বিষয়ে কারস্টিন মারিয়া হামবার্গ নামের এক জার্মান গবেষক ও কনসালট্যান্ট সামাজিক ব্যবসা হিসেবে পরিচালিত গ্রামীণের বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগের ওপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাটি ২০১২ সালে *Poverty Reduction through Social Business? Lessons Learnt from Grameen Joint Ventures in Bangladesh* শীর্ষক পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পুস্তকে বর্ণিত গ্রামীণ-ডানোন ফুডস লি: এর ওপর করা কেস স্টাডি থেকে চলুন দেখা যাক দইয়ের কাপের মাধ্যমে দুনিয়া আসলে কতটা উদ্ধার করা গেল।

অপুষ্ট শিশুদের পুষ্টি

প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা করা হয়, কারখানার ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে শক্তি দই বিক্রি করা হবে। বগুড়া জেলার মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের বয়স ৩ থেকে ১৫ বছর ধরে নিয়ে হিসাব করা হয় ক্রেতার সংখ্যা হবে ৭ লাখ ৫০ হাজার। বাস্তবে ৩০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বিক্রি কম হওয়ায় গ্রামীণ-ডানোন ক্রমাগত বিক্রির এলাকা বাড়াতে থাকে– বর্তমানে উৎপাদিত দইয়ের দুই-

তৃতীয়াংশই বিক্রি হয় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর এলাকায়! তার পরও গ্রামীণ-ডানোন ক্রমাগত আর্থিক সঙ্গতি গুণে যাচ্ছে। ২০০৭ সালে এর পরিমাণ ছিলো এক কোটি ৬৪ লাখ টাকা, ২০০৮ সালে দুই কোটি ২৮ লাখ টাকা এবং ২০০৯ সালে তিন কোটি ২৫ লাখ টাকা। অথচ পরিকল্পনা ছিল, ক্রমাগত লাভের মাধ্যমে সারা দেশে একটার পর একটা নতুন দইয়ের কারখানা স্থাপন করা হবে, ২০১০ সালে কারখানার সংখ্যা হবে ১০টি এবং ২০১৮ সালে হবে ৫০টি। দই বিক্রি না হওয়া এবং ক্রমাগত আর্থিক ক্ষতি হওয়ার কারণে নতুন নতুন কারখানা স্থাপন তো দূরের কথা, গ্রামীণ কিংবা ডানোনের কর্মকর্তারা বলতে পারছেন না ঠিক কবে তাঁরা ব্রেক ইভেন পয়েন্টে (না-লাভ না-ক্ষতি অবস্থায়) পৌঁছাতে পারবেন!

প্রথমে ৮০ গ্রামের একটি শক্তি দইয়ের কাপের দাম ধরা হয় ৫ টাকা। কিন্তু উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় তারা কাপের সাইজ ৮০ গ্রাম থেকে ৬০ গ্রামে নামিয়ে আনে এবং দাম ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিক্রি হয় খুবই কম। ২০০৮ সালে ১২৭ টন দই বিক্রি হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬%। এরপর ২০০৯ সালে বিক্রি বেড়ে ৭০৭ টন হয়, কিন্তু এই বিক্রির দুই-তৃতীয়াংশই হয় শহরে। অর্থাৎ গ্রামীণ-ডানোন তার মূল উদ্দেশ্য অনুসারে গ্রামের দরিদ্র শিশুদের হাতে শক্তি দই পৌঁছাতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে গবেষণায় যে বিষয়গুলো উঠে আসে তা হলো, ৬ টাকা বা ৭ টাকা দামে গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলোর পক্ষে শিশুদের জন্য শক্তি দই কেনা কঠিন। পরিবারগুলোর গড় আয় মাসে দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার অর্থাৎ দৈনিক ৬৬ থেকে ১৬৬ টাকা। দই কেনার চেয়ে চাল কেনাই তাদের কাছে প্রথম অগ্রাধিকার। গ্রামীণ-ডানোনের বিপণন ব্যবস্থাপকদের বক্তব্য অনুসারে, যদি তাদের হাতে ১০ টাকা থাকে তাহলে তারা প্রথমে চাল, সবজি এবং যদি সম্ভব হয় মাছ কেনার কথা ভাবে (হামবার্গ, ২০১২: ১৩৪-১৫২)।

মাইলের পর মাইল হেঁটে ৫০ কাপ দই বিক্রির অর্থ দাঁড়ায় সর্বমোট ৭০ টাকা, যা ঐ অঞ্চলের একজন দিনমজুরের গড় দৈনিক মজুরির (১৫০ টাকা) অর্ধেকেরও কম!

গ্রামীণ-ডানোন কি জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পেরেছে?

গবেষণাটি থেকে আরো দেখা যায়, গ্রামীণ-ডানোন তার ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নের কাজেও ব্যর্থ হয়েছে:

- শক্তি দই গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিক্রির জন্য পর্যাপ্ত নারী বিক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এর কারণ হলো, দৈনিক ন্যূনতম ৫০ কাপ দই বিক্রি করতে পারলে তাদের দৈনিক মাত্র ৪০ টাকা মজুরি দেওয়া হয়। এর সাথে কাপপ্রতি ৬০ পয়সা কমিশনের অর্থ যোগ করলে মাইলের পর মাইল হেঁটে ৫০ কাপ দই বিক্রির অর্থ দাঁড়ায় সর্বমোট ৭০ টাকা, যা ঐ অঞ্চলের একজন দিনমজুরের গড় দৈনিক মজুরির (১৫০ টাকা) অর্ধেকেরও কম! এমনকি গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা নারীরাও দই বিক্রেতা হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী নয়; কারণ দৈনিক যে আয় হয় তা থেকে এমনকি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি পর্যন্ত শোধ করা সম্ভব নয়। ফলে এই বিক্রেতা নারীদের ঋরে পড়ার হার ৬০ শতাংশেরও বেশি। ২০১০ সাল নাগাদ মোট ৬৫৫ জন নারী বিক্রেতা তালিকাভুক্ত হলেও বাস্তবে কাজ করছে এ রকম নারীর সংখ্যা মাত্র ১৭৫। গবেষকের কাছে সাক্ষাৎকারে অনেক নারী বিক্রেতাই বলেছেন, পাঁচ কেজি ওজনের দই নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে তাঁদের পা ফুলে যায়। কিন্তু টার্গেট অনুযায়ী ৫০ কাপ দই সহজে বিক্রি হয় না। তাছাড়া ঘুরে ঘুরে দই বিক্রি করতে গিয়ে তাঁদের নানাভাবে অপমানিতও হতে হয়। দরিদ্র গ্রামবাসী প্রায়ই শক্তি দই বিক্রেতা নারীদের ওপর রাগ করে বলে, 'আমাদের কোনো টাকা-পয়সা নাই, যান এখান থেকে' কিংবা 'কেন আপনারা আমাদের সন্তানদের কাঁদানোর জন্য এই গ্রামে আসেন?'
- শুধু নারী বিক্রেতাই নয়, এমনকি গ্রামীণ-ডানোনের বিপণন সহযোগী ও উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত কর্মীরাও বাজারদরের চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করছে। ২০১০ সালে একজন বিপণন সহযোগীর বেতন পাঁচ হাজার ৫০০ এবং উৎপাদন সহযোগী নারীর বেতন চার হাজার টাকা (দৈনিক ১৩৩ টাকা), যা স্থানীয় বাজারদর, এমনকি দারিদ্র্যসীমার তুলনায়ও কম। গবেষক হামবার্গ এ বিষয়ে লিখেছেন, যদিও ইউনূস সামাজিক ব্যবসায় ন্যায্য মজুরির ব্যাপারে জোর দিয়েছেন, কিন্তু কোম্পানির ব্যবস্থাপকরা জানিয়েছেন, এর চেয়ে বেশি মজুরি দেওয়ার সামর্থ্য কোম্পানির নেই।
- এমনকি চুক্তি ভিত্তিতে গ্রামীণ-ডানোন যেসব দুধ বিক্রেতাদের কাছ থেকে নিয়মিত কেনে, তাঁরাও বাজারদরের চেয়ে কমে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। গবেষকের কাছে স্থানীয় দুধ বিক্রেতারা অভিযোগ করেছেন যে গ্রামীণ-ডানোন সের (৯০০ মিলিলিটার)-এর বদলে লিটারে ক্রয় করার কারণে বাজারদরের তুলনায় তাঁরা দুই টাকা করে কম পান গ্রামীণ-ডানোনের কাছ থেকে। উদাহরণস্বরূপ, বাজারদরে প্রতি সের (৯০০ মিলিলিটার) দুধের দাম ২৫ টাকা হারে স্থানীয় বাজারে একজন চাষি দেড় লিটার দুধ বিক্রি করলে তাঁর আয় হয় ৪২ টাকা, অথচ গ্রামীণ-ডানোনের কাছে বিক্রি করলে পান ৩৮ টাকা। তাছাড়া তাঁরা আরো অভিযোগ করেছেন, চুক্তি ভিত্তিতে স্থির দামে বিক্রি করার কারণে মৌসুমি মূল্যবৃদ্ধির সময় তাঁদের আরো বাড়তি ক্ষতি হয় (হামবার্গ, ২০১২: ১৫৩-১৭০)।

কারস্টিন হামবার্গ তাঁর গবেষণায় গ্রামীণ-ডানোন সামাজিক ব্যবসাটির সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেছেন এভাবে:

- যাদের উদ্দেশ্যে এই সামাজিক ব্যবসা, তাদের কাছেই পৌঁছাচ্ছে না এর সেবা।
- টেকসই নয়, কেননা কোম্পানি বিপুল আর্থিক ক্ষতিতে চলছে। বহুজাতিক ডানোন না হয়ে সাধারণ সামাজিক ব্যবসায়ী হলে টিকে থাকা সম্ভব হতো না।
- গ্রামীণ-ডানোনের পক্ষে একই সাথে তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।
- ডানোনের আর্থিক, কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে কোনোভাবে একটি স্থানে টিকতে পারলেও সারা দেশে তা টেকসইভাবে চালানো দুরূহ।
- টিকে থাকলে দীর্ঘ মেয়াদে স্থানীয় দই উৎপাদকদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে (হামবার্গ, ২০১২:১৭৪-১৭৫)।

সামাজিক ব্যবসা হিসেবে গ্রামীণ-ডানোন সম্পর্কে হামবার্গ তাঁর মতামতটি দিয়েছেন এভাবে:

যথাযথভাবে বলতে গেলে, গ্রামীণ-ডানোন প্রকল্প এখন পর্যন্ত ইউনূসের সামাজিক ব্যবসা ধারণাটির সপক্ষে কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারেনি (হামবার্গ, ২০১২:১৭৬)।

উপর্যুক্ত কেস স্টাডি থেকে কারোরই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে বহুজাতিক পুঁজি ও প্রযুক্তির বিপুল সহায়তা নেওয়ার পরও 'সামাজিক ব্যবসা' হিসেবে গ্রামীণ-ডানোন পুরোপুরি ব্যর্থ একটি

উদ্যোগ। সামাজিক ব্যবসার নিয়ম অনুসারে গ্রামীণ-ডানোনের এই যৌথ উদ্যোগ থেকে বহুজাতিক ডানোন কর্তৃক ডিভিডেন্ড বা মুনাফা না নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলেও পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মেই গ্রামীণ-ডানোন শক্তি দই নামের পণ্যটি উৎপাদন ও বিক্রয়ের বেলায় বাজারের আর দশটা কোম্পানির মতোই আচরণ করছে। বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকতে হলে সকল কোম্পানিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়, বাজারে টিকে থাকার জন্য উৎপাদন খরচ ও শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, বিজ্ঞাপন ও বাজারজাতকরণের পেছনে অর্থ খরচ করতে হয় ইত্যাদি। বাজার অর্থনীতির বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই গ্রামীণ-ডানোন উৎপাদিত পণ্যের দাম দরিদ্র ক্রেতার আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারেনি, প্রথমে যে মূল্য নির্ধারণ করেছিল, কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়া ও কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ বিক্রি না হওয়ার কারণে তা আরো বাড়াতে হয়েছে, পণ্যের আকার ছোট করতে হয়েছে, এমনকি গরিব ক্রেতার শিশুসন্তানের পুষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি দই শহুরে ক্রেতার কাছে বিক্রির দিকে যেতে হয়েছে, বিক্রি বাড়ানোর জন্য আর দশটা পণ্যের মতোই চটকদার বিজ্ঞাপনের পেছনে খরচ করতে হয়েছে। এইসব করতে গিয়ে কথিত সামাজিক ব্যবসার ঘোষিত সামাজিক উদ্দেশ্যটাই লাটে উঠেছে– দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি জোগানো তো দূরের কথা, এমনকি বাজারের প্রচলিত হারের চেয়েও কম মজুরি দিয়েছে শ্রমিকদের। দেখা গেল, শ্রমিকের শোষিত হওয়া না হওয়াটা বিনিয়োগকারী মুনাফা তুলে নিল, নাকি কোম্পানির বিকাশের কাজে পুনর্বিনিয়োগ করল, তার ওপর নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কোম্পানির মুনাফা করার ওপর। কোম্পানি যতক্ষণ মুনাফা করবে ততক্ষণ শ্রমশোষণ হবেই, পুঁজিতন্ত্রের নিয়মেই শ্রমিক তার শ্রমের ফসল থেকে বঞ্চিত হবে।

শুধু ডানোনের বেলায়ই নয়, দরিদ্র মানুষের কাছে পানি বিক্রির গ্রামীণ-ভিয়োলিয়া প্রকল্পের বেলায়ও সামাজিক ব্যবসাকে বহুজাতিক কোম্পানির মূল ব্যবসার সহায়ক কর্ম হিসেবে দেখা হয়েছে।

এত কিছুর পরও মুহাম্মদ ইউনূস (২০১০:৫৬) তাঁর সামাজিক ব্যবসা তত্ত্বের ভ্রান্তি ও ব্যর্থতা স্বীকার করছেন না, উল্টো বলছেন–

'যদিও গ্রামীণ-ডানোনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে অনেক বেশি উত্থান-পতন আছে, এই অভিজ্ঞতা সামাজিক ব্যবসা পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে আমার বিশ্বাসকে আরো মজবুত করেছে, শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না, সারা দুনিয়ার ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।'

আসলে শিশুদের অপুষ্টির মূল কারণ তাদের পিতা-মাতার দারিদ্র্য, পিতা-মাতার দারিদ্র্যের কারণেই শিশুরা তিন বেলা সুষম খাবার খেতে পায় না, যার ফলাফল পুষ্টিহীনতা। গ্রামীণ কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য দূর না করে দই খাইয়ে শিশুদের অপুষ্টি দূর করা সম্ভব নয়। আর গ্রামীণ কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য দূর করতে হলে ভূমি সংস্কার করতে হবে, ভূমিহীন কৃষককে ভূমির অধিকার দিতে হবে, কৃষকের হাতে প্রয়োজনীয় বীজ, সারের জোগান দিতে হবে, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিতে হবে, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করে সারা বছর নিয়মিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই কাজগুলো ঐতিহাসিকভাবেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব, রাষ্ট্রকেই এগুলো নিশ্চিত করতে হয়। দুনিয়ার যেখানে যতটুকু দারিদ্র্য দূর হয়েছে, এভাবেই হয়েছে। ড. ইউনূস উল্লিখিত 'স্মার্ট' ইউরোপীয় দেশগুলোও এভাবেই তাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে চরম দারিদ্র্য দূর করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বেকারত্ব নিয়ে ইউনূস সাহেবরা যত কাঁদুনিই গান না কেন, ভুলেও এসব কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলবেন না, রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলবেন না, স্থানীয় শাসক বুর্জোয়া ও বিশ্বপুঁজির মোড়ল বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের 'দারিদ্র্য পুনরুৎপাদন কর্মসূচি'র বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন না; কারণ সেক্ষেত্রে দুনিয়াজুড়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে কর্পোরেট পুঁজির জন্য দারিদ্র্য ব্যবসার ফ্র্যানচাইজি খোলা লাটে উঠবে।

বহুজাতিকের সামাজিক ব্যবসা

মুহাম্মদ ইউনূস না হয় কোনো কিছু না পাল্টেই দুনিয়া পাল্টানোর ব্যবসা করবেন বলে সামাজিক ব্যবসা শুরু করেছেন। তাহলে প্রশ্ন হলো, মুনাফা তুলে নিতে পারবে না জেনেও ডানোন বা ভিয়োলিয়ার মতো বহুজাতিকরা কেন এই তথাকথিত সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছে? বিবিসির জেমস মিলিক এ বিষয়ে লিখেছেন:

'ডানোন ২০০৮ সালে এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মুনাফা করেছে এবং আশা করছে ইউরোপে বিক্রিবাট্টা কমে যাওয়ার পরও এ বছর (২০০৯ সালে) মুনাফা আগের চেয়ে ১০% বৃদ্ধি পাবে।

কোম্পানির নজর এখন দক্ষিণ এশিয়ার দিকে। কিন্তু সেখানে সাফল্যের জন্য তাকে শিখতে হবে কেমন করে গ্রামে বসবাসকারী নিম্নআয়ের কাস্টমারের কাছে বিক্রি করতে হয়। স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে বাংলাদেশে ডানোন একটা ভিন্ন ধরনের দইয়ের কারখানা স্থাপন করেছে, ড. ইউনূস যাকে বলছেন 'সামাজিক ব্যবসা' (মেলিক, ২০০৯)।

তাছাড়া করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি দেখানোর একটা ব্যাপার তো আছেই! কাজেই একদিকে সোশ্যাল ব্র্যান্ডিং, অন্যদিকে মূল্যবান মার্কেটিং কৌশলের অভিজ্ঞতা লাভ– এ দুই মিলিয়েই তাদের এই 'সামাজিক বিনিয়োগ'। তাছাড়া এই বিনিয়োগের জন্য তো আর তাদের খুব বেশি খরচ বা ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না। ডানোনের মুখপাত্র ইমানুয়েল মারচেন্ট জানাচ্ছেন:

'আমাদের আর দশটা কারখানার তুলনায় ১০০ গুণ ছোট একটা কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে একটা নতুন এলাকায় প্রবেশ করা তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিহীন আর আমাদের শেয়ারহোল্ডারও সেটা বোঝেন (উদ্ধৃত মেলিক, ২০০৯)।'

শুধু ডানোনের বেলায়ই নয়, দরিদ্র মানুষের কাছে পানি বিক্রির গ্রামীণ-ভিয়োলিয়া প্রকল্পের বেলায়ও সামাজিক ব্যবসাকে বহুজাতিক কোম্পানির মূল ব্যবসার সহায়ক কর্ম হিসেবে দেখা হয়েছে। ইউনূস (২০১০: ১৩৯) এ বিষয়ে কোনো রাখঢাক না রেখেই বলেছেন:

'পানি সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্বায়ন নিয়ে বিতর্ক ও পানির বেসরকারীকরণ যখন ভিয়োলিয়া ওয়াটারের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে, তখন পানিকে কেন্দ্র করে একটা পজিটিভ ভূমিকা রাখা ভিয়োলিয়ার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।'

ভিয়োলিয়া ওয়াটারের সিইও অ্যান্টনি ফ্রেরট আরো পরিষ্কার করে বলেছেন পানি বাণিজ্য করতে গিয়ে তাঁদের বিপদের কথা এবং সেই বিপদ থেকে উদ্ধারে গ্রামীণ-ভিয়োলিয়া সামাজিক ব্যবসার সম্ভাব্য ভূমিকার কথা:

'কিন্তু মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারে না আমাদের কাজটা কী।

অনেক সময় গণমাধ্যমে আমাদের আক্রমণ করা হয়। আমাদের কর্মীদের জন্য এটা খুব বেদনাদায়ক। তারা মানুষকে ভালো সেবা দিতে কঠোর পরিশ্রম করে– পানি শোধনের নতুন নতুন উপায় বের করা থেকে শুরু করে ছুটির দিনগুলোতেও পানির পাম্প মেরামত ও লিক সারানোর কাজ। সুতরাং আমরা যখন বাংলাদেশে সামাজিক ব্যবসার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম, তখন তা আমাদের কর্মীদের জন্য দারুণ উত্তেজনাকর একটা ব্যাপার– একেবারে একঝলক খোলা হাওয়ার মতো। ভিয়োলিয়া ওয়াটার ও তার কর্মীরা পানিকে কেন্দ্র করে সামাজিক ব্যবসায় যে পজিটিভ ভূমিকা রাখতে চায়, এটা তার সুবর্ণ সুযোগ' (ইউনূস, ২০১০: ১৪০)।'

উপসংহার

মুহাম্মদ ইউনূসের সামাজিক ব্যবসার ধারণা ও গ্রামীণ-ডানোন প্রকল্পে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার এই বিচার-বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাজারের আর দশটা কোম্পানির মতোই আচরণ করছে। ডিভিডেন্ড বা মুনাফা না নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলেও পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, কাঁচামাল সংগ্রহ, শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ, পণ্যের বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকা অন্য কোম্পানির সাথে সামাজিক ব্যবসার কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘোষিত উদ্দেশ্য প্রমাণ করার তাগিদ থাকলেও এবং পেছনে বহুজাতিক পুঁজির আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা থাকলেও মুহাম্মদ ইউনূসের সামাজিক ব্যবসা দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি জোগানো ও স্থানীয় জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণ তো পরের কথা, ন্যায্য মুজরি পর্যন্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম অনুসারেই তা শ্রমশোষণ জারি রেখেছে; যদিও উদ্দেশ্যটাকে দেখানো হয়েছে মহৎ! সামাজিক ব্যবসা ধারণাটি বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট পুঁজির কাছে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার তাৎপর্যটা এখানেই। গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশনের এক অনুষ্ঠানে গ্রামীণ-ডানোনের কারখানা সম্পর্কে ড. ইউনূস বলেছিলেন, *'এটা ছোট্ট একটা প্লান্ট হলেও এর মেসেজ বা বার্তাটি কিন্তু ছোট নয়।'* ডানোনের সিইও *ফ্র্যাংক রিবোড তার সাথে যোগ করেছিলেন, 'আমরা পয়সা বানানোর সময় একই সাথে ভালো কাজও করতে পারি। ...আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে নতুন নতুন ব্যবসার মডেল এবং নতুন ধরনের কর্পোরেশন গঠন করার সামর্থ্যের ওপর' (কেলি, ২০০৯)।*

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সংকটের সময় যখন দুনিয়াজুড়েই কর্পোরেট পুঁজির আগ্রাসনের চেহারা উন্মোচিত, যখন জীবন ও পরিবেশের ওপর এই ব্যবস্থার হুমকির বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্যে গোটা বিশ্বব্যবস্থা পাল্টানোর প্রশ্ন উঠছে, তখন কেবল ড. ইউনূসই নয়, এই ব্যবস্থার সুবিধাভোগী শ্রেণি, যারা এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তাদের প্রায় সবার মধ্যেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নতুন ব্র্যান্ডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এদের উদ্দেশ্য একটাই– মুনাফার গায়ে সামাজিক উদ্দেশ্যের তকমা এঁটে বর্তমান অর্থব্যবস্থার ভাবমূর্তির সংকটটিকে সামাল দেওয়া এবং সেই সাথে বিনিয়োগের নতুন নতুন চ্যানেল উন্মুক্ত করা। ড. মুহাম্মদ ইউনূস সামাজিক ব্যবসা ধারণাটির মাধ্যমে তাদের সেই আকুতিরই একটি বৈশ্বিক ভাষা দিয়েছেন, যে কারণে বিশ্বপুঁজির মোড়লদের কাছে সামাজিক ব্যবসার এত কদর। দরিদ্র মানুষের কাছে পুষ্টি বিক্রির গ্রামীণ-ডানোন কিংবা গ্রামীণ-বিএএসএফ প্রকল্প, পানি বাণিজ্যের গ্রামীণ-ভিয়োলিয়া প্রকল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিক্রি করার গ্রামীণ ইন্টেল প্রকল্প, চক্ষু চিকিৎসাসেবা বাণিজ্যের গ্রামীণ জিসি আই কেয়ার প্রজেক্টসহ দেশে-বিদেশে ড. ইউনূসের সামাজিক ব্যবসা প্রকল্পগুলোর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলো মূলত খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন সেবা খাত, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় খাত হিসেবে এখনও বিবেচিত, সর্বজনের জন্য যেগুলোর ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, সেগুলো নিয়ে ব্যবসা করছে। সামাজিক ব্যবসা একদিকে সর্বজনের সম্পদ ও অধিকার নিয়ে ব্যবসার নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করছে, অন্যদিকে এর মাধ্যমে শুধু বহুজাতিক কোম্পানির ব্র্যান্ডিংই নয়, গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই নয়া ব্র্যান্ডিংয়ের চেষ্টা করছে।

কল্লোল মোস্তফা: প্রকৌশলী, লেখক

ইমেইল: kallol_mustafa@yahoo.com

তথ্যসূত্র:

[আজমেরি] Ajmeri, Dr. Sanjay (2012), Entrepreneurship Development, Lulu.

[ইউনূস] Yunus, Muhammad (2007), Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism, New York: Public Affairs.

[ইউনূস] Yunus, Muhammad (2010), Building Social Business: The new kind of Capitalism that serves Humanity's Most Pressing Needs, New York: Public Affairs.

[ইউনূস সেন্টার] Yunus Centre (2007), Social Business, 25 December 2007, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংগৃহীত, পাওয়া যাবে- http://www.muhammadyunus.org/index.php/social-business/social-business.

[কেলি] Kelly, Marjorie (2009), Not Just for Profit, strategy-business.com, 24 February 2015, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংগৃহীত, পাওয়া যাবে- http://www.strategy-business.com/article/09105?pg=0&tid=27782251

[গ্রামীন ডানোন] Grameen Danone Foods Ltd (2010), a Social Business in Bangladesh, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংগৃহীত, পাওয়া যাবে- http://www.muhammadyunus.org/images/stories/in_the_media/gdfl_bp_210510.pdf

[গাসপার] Gasper, Phil (2014), Are workers' cooperatives the alternative to capitalism? International Socialist Review, Issue-93, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংগৃহীত, পাওয়া যাবে- http://isreview.org/issue/93/are-workers-cooperatives-alternative-capitalism

[ফরচুন] Fortune Magazine (2007), Saving the world with a cup of yogurt, March 15, 2007, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংগৃহীত, পাওয়া যাবে- http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/02/05/8399198/index.htm

[মেলিক] Melik, James (2009), Danone's yogurt strategy for Bangladesh, 9 July 2009, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংগৃহীত, পাওয়া যাবে- http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8100183.stm

[হামবার্গ] Humberg, Kerstin (2012), Poverty Reduction through Social Business? Lessons learnt from Grameen Joint Ventures in Bangladesh, Oekom, 2012. ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংগৃহীত, পাওয়া যাবে- http://www.danonecommunities.com/sites/default/files/humberg_2011_i_poverty_reduction_through_social_business_i_chapter_7_i_grameen_danone_case_study.pdf

[হ্যারিসন] Harrison, J.F.C (2009), Robert Owen and The Owenites In Britain And America: The Quest for the New Moral World, Routledge.